ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 2022-2033
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.427

সেলিনা হোসেনের ‘নীল ময়ূরের যৌবন’ উপন্যাসের ডোম্বি: প্রেমে, প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে

সুকন্যা পাঁজা, *গবেষিকা, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Since the very dawn of civilization, the role of women in society has been of paramount importance. Yet, society has not been willing to accord them recognition with ease. Nevertheless, women have never faltered in their struggle to claim their rightful entitlements. Dombi—a character in Selina Hossain's novel 'Nil Moyurer Joubon' (The Youth of the Blue Peacock), set against the backdrop of the 10th to 12th centuries—stands as just such an indomitable figure. Although the novel features an array of female characters, Dombi remains truly extraordinary in terms of her personality, her capacity for love, and her spirit of resistance. Her spirited persona continues to evoke a sense of awe even among the women of the twenty-first century.

Keywords: Women's Autonomy, 10th–12th Centuries, Charyapada, Kanha, Mallari, Dombi, Boat, Hunting, Subalterns, Brahmanism

পুরুষের চোখে বা সমাজের চোখে নারীর অবস্থান যাই হোক না কেন আবহমানকাল থেকেই নারী স্বাধীনতাকামী ও যথেষ্ট সক্রিয়। তার সক্রিয়তা যেমন ন্যায়ের নির্মাণের সাথে ও শুভর প্রতিষ্ঠার সাথে যুক্ত,তেমনই নিজের বা সমাজের সাথে ঘটা যেকোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধেও নারী বারেবারে রুখে দাঁড়িয়েছে। আবার সে অন্যায় যদি তার কোনো প্রিয়তম ব্যক্তির সাথে হয়, সেখানে নারীর মূর্তি আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। হিন্দুপুরাণে সতীকে স্বামীর অপমানের প্রতিবাদে দেহত্যাগ করতে দেখা গেছে। প্রিয় মানুষের দেওয়া আঘাতও তার কাছে অসহনীয়।তাইতো ‘রামায়ণ’-এর সীতা প্রিয়তমের থেকে অসতীর অপবাদ সহ্য করতে না পেরে পাতাল প্রবেশ করেছেন।অন্যদিকে ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ নিজের দেশকে রক্ষা করতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসের পাতায় পাতায় নারীর প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের একাধিক কাহিনী আজকের নারীকেও সকল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে আপন লক্ষ্য জয় করার অনুপ্রেরণা যোগায়। নজরুল ইসলাম ‘নারী’ কবিতায় বলেছেন,

> “বিশ্বের যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
> অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।”[১]

নজরুল ইসলামের এই উক্তিতেই নারী সম্পর্কিত ‘Second Sex’ তত্ত্বটি নস্যাৎ হয়ে যায়। আসলে ‘নারীবাদ’ বা ‘feminism’ শব্দটি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে প্রচলিত হলেও নারী কিন্তু আবহমান কাল ধরেই বৃহৎ সংসারের সাথে নিজেকে যুক্ত করতে তৎপর। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার দাবির সাথে ফরাসি

মহিলারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিষয়টিকে যুক্ত করে তাকে একটি সার্বিক রূপদান করেন ও সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেন। এটিই নারীবাদী আন্দোলনের প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এরপর ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার দাস প্রথার বিরুদ্ধে নারীসমাজের আন্দোলন বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর প্রবেশকে চিহ্নিত করে। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে দীর্ঘ আন্দোলনের পর নিউজিল্যান্ডের মহিলারা ভোটদানের অধিকারী হন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্কের কোপেনহাগেনে কমিউনিস্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে বিশ্বজুড়ে নারীদের একত্র করার প্রয়াস শুরু হয় ও তারই ফলশ্রুতি রূপে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ৮ মার্চ প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। এই নারী দিবস পালন বা নারীর ভোটাধিকার প্রাপ্তি নারীর সত্যিকারের ঠিক কতটা উন্নতি করেছিল সেই বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে, যখন ১৯২৯ সালে ভার্জিনিয়া উলফ 'A Room of One's Own' গ্রন্থে 'নারী কি?'- এই প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন যে,সমাজে পুরুষদের প্রধান বলে বিবেচনা করা হয়। আর নারীরা হলো 'অন্য নির্ভর'।

ভারতবর্ষের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে দ্রাবিড় জাতি বা মোঙ্গলীয় জাতির সভ্যতা ছিল মাতৃতান্ত্রিক। ঋগ্ -বৈদিক যুগে নারী-পুরুষ সবাই বেদ অধ্যায়নের সুযোগ পেতো। উপনিষদের যুগেও নারীর অধিকার রক্ষিত ছিল। সেই সময়কার যে ছত্রিশ জন ঋষির নাম পাওয়া যায়,তাঁরা প্রত্যেকেই মায়ের নামে পরিচিত ছিলেন। যেমন- গৌতমীপুত্র, কৌশিকীপুত্র, ভার্গবীপুত্র । তবে 'মনুসংহিতা' ও 'মহাভারত'-এর 'অনুশাসন পর্ব'-এ নারীকে পুরুষের অধীনস্থ করার প্রয়াস দেখা গেছে। বৌদ্ধযুগেও যে নারীর স্বাধীনতা মোটামুটি বজায় ছিল তার প্রমাণ 'মৈত্রেয় জাতক' এর বিশাখা ও তার মা সুমনা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে তুর্কি আক্রমণের সময় থেকে নারীর স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়। এরপর ইংরেজ

১

শাসনকালে ভারতবর্ষে নারীর অবস্থার ধীরেধীরে উন্নতি হতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারে ব্রতী হন। তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সতীদাহ প্রথা,কৌলিন্য প্রথার বিলোপ ঘটে। বিধবাবিবাহের পক্ষে জনমত গড়ে উঠতে থাকে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বেথুন সাহেব নারীশিক্ষার প্রসারে মনোযোগ দেন। - এতো গেল ইতিহাসের কথা। কিন্তু বাংলা সাহিত্য প্রথম থেকেই নারীর সার্বিক স্বাধীনতার পক্ষপাতী। পাশ্চাত্যে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে কিছু নারীবাদী প্রবন্ধ রচিত হলেও নারীর স্বাধীনতার কথা প্রথম স্পষ্টভাবে এসেছিল ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে মেরী ওলস্টোন ক্রাফটের 'A Vindication of the Rights of Women' গ্রন্থে। বাংলা সাহিত্যের সূচনালগ্নে পাশ্চাত্যের 'নারীবাদ' বা 'feminism' হয়তো স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়নি, কিন্তু সচেতনভাবেই হোক বা অসচেতনভাবে, বাংলা সাহিত্যে নারীর দাবিদাওয়া চিরকালই গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন 'চর্যাপদ'-এ নারীরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ও জীবনসঙ্গী নির্বাচনে স্বাধীন। তারা পুরুষ যোগীর সাধন-সঙ্গিনী বা যোগিনী হিসেবে কায়সাধনায়, তন্ত্রসাধনায় অংশগ্রহণ করত। তবে 'চর্যাপদ'-এর সময় বহু অসতী ও বহুগামী নারীরও উল্লেখ পাওয়া যায়,-

"কাহ্নে গাইতু কামচণ্ডালী।
ডোংবিত আগলি ণাহি ছিণালী।।"[২]

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ কিন্তু নারীর বন্দী দশার চিত্র দেখা গেছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর রাধার বাল্যবিবাহ হয়েছিল। সুন্দরী রাধাকে তার শাশুড়ি মা প্রথমে দুধ-দইয়ের পসরা নিয়ে বাজারে যেতে অনুমতি দেননি। কিন্তু সমাজের চাপে পড়ে তাকে হাটে যাওয়ার অনুমতি দিতে হয়। সেক্ষেত্রে বড়াইকে রাধার প্রহরায় নিযুক্ত করা হয়। রাধাও সামাজিক ও পারিবারিক নিয়ম মেনে সতীত্বের সংস্কারবশতই হোক বা স্বামীপ্রেমের কারণেই হোক 'তাম্বুল

খন্ড'-এ কৃষ্ণের দেওয়া কর্পূর- তাম্বুল পদদলিত করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে কৃষ্ণপ্রেমে সমস্ত সামাজিক চোখরাঙানি রাধার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে। সেজন্য তাকে কম সামাজিক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়নি,

> "সমাজের বিধিবিধানের শৃঙ্খলার নিগড় যা নারীজীবনকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিল অক্টোপাসের মতো, তারই চাপে পড়ে রাধা নাম্নী একটি বালা যে কিনা সেকালের নারীধর্মের সামাজিক প্রতিরূপ, লাঞ্ছিতা, অপমানিতা হয়ে বুকফাটা আর্তনাদ ব্যক্ত করেছে চিরকাল, চোখের জলে মধ্যযুগের মাটিকে সিক্ত করেছে।"[৩]

পরবর্তী সময়ে মঙ্গলকাব্যের যুগে প্রতিবাদী নারী বলতে মনসা দেবীর কথা প্রথমে মনে আসে। দেবীত্বে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য তাঁর সংগ্রাম তাঁকে মর্ত্যমানবীতে পরিণত করেছে। 'মনসামঙ্গল'-এ বেহুলা তার স্বামী লখিন্দরের জীবন ফিরে পেতে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে।তার স্বামীপ্রেমই তাকে পথের বাধা ও পরপুরুষের প্রলোভনকে জয় করার শক্তি জুগিয়েছিল । কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চন্ডীমঙ্গল' রচিত হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীতে। সেই সময় সতীনের সাথে ঘর করা ছিল খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।দেবী চণ্ডী সুন্দরী রমণীর ছদ্মবেশে ফুল্লরার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলে ফুল্লরা ভেবেছে কালকেতু এই সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করেছে। কিন্তু ফুল্লরা কালকেতুর জীবনে একেশ্বরী হয়েই থাকতে চায়। তাই সে সেই রমণীকে গৃহছাড়া করার মতলবে নিজেদের দুঃখের বারোমাস্যা অতিরঞ্জিত করে শুনিয়েছে। যেখানে ধনপতিপত্নী লহনা পাঁচতোলা সোনা ও পাটশাড়ি পেয়ে ধনপতিকে দ্বিতীয় বিবাহের সম্মতি দিয়েছে, সেখানে ফুল্লরার এহেন আচরণ বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের কানাড়া বীর্যবতী তেজস্বিনী যুবতী ও লখাই বীরমাতা। রঞ্জার পুত্রবধূ কলিঙ্গা যুদ্ধবিদ্যায় ও বীরাঙ্গনাসুলভ আচরণে বীর লাউসেনের যোগ্য পত্নী। সেকালের পুরুষশাসিত সমাজে যেখানে নারীর মন্ত্র উচ্চারণে কোন অধিকার ছিল না সেখানে 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে আমুলা ও শামুলা নামক নারী পুরোহিতের সন্ধান পাওয়া গেছে। 'অন্নদামঙ্গল'-এর 'বিদ্যাসুন্দর' খণ্ডে 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশ মধ্যযুগের সাহিত্যে এক বিরল নিদর্শন। এই অংশে স্বামীকে নিয়ে নিজেদের অতৃপ্তির কথা নারীরা স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছে-

> "এক রামা বলে শুন মোর দুখ।
> আমারে মিলিল পতি কালা কালা মুখ।।
> সাধ করি শিখিলাম কাব্যরস যত।
> কালার কপালে পড়ি সব হৈল হত।।"[৪]

এই কাব্যের বিদ্যা স্বেচ্ছায় অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত ছিল। বিদ্যা ও সুন্দরের সম্ভোগ কেবল পুরুষের নারীভোগ নয়, তা নারী ও পুরুষের মিলিত যৌনাচার। আরাকান রাজসভার কবি সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যে পদ্মাবতীর বীরত্ব ও সতীত্ব তাকে অগ্নিস্নানে নির্ভীক করে তুলেছে। 'লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না' তে চন্দ্রানী নপুংসক স্বামীকে ত্যাগ করে প্রেমাস্পদ লোরকে বরণ করেছে। 'ময়মনসিংহ গীতিকা'-র মহুয়া, মলুয়ারা শত প্রলোভনেও সতীত্ব হারায়নি। প্রিয়তমের প্রেমে তারা অসাধ্যসাধনে ব্রতী। শুধু প্রেমের প্রসঙ্গেই নয়,গ্রামকে রক্ষার্থে কমলার আত্মত্যাগ সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাটিকে চিহ্নিত করে। উনিশ শতকের সমাজসংস্কারের ছায়া এসে পড়েছিল সমসাময়িক সাহিত্যেও। মুধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা কাব্য'-এ শোনা গেছে নারীমুক্তির বলিষ্ঠ সুর। সেখানে বৃহস্পতিপত্নী তারা সামাজিকতার উর্ধ্বে উঠে পতির শিষ্যের সাথে সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে। শকুন্তলা, সূর্পণখা, দ্রৌপদী, রুক্মিণী, কেকয়ীরা নিজেদের মনের প্রেম, বিরহ বা অভিযোগের কথা দ্বিধাহীনভাবে প্রেমাস্পদকে জানিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কুন্দনন্দিনী, হীরা, রোহিণী বা 'চতুরঙ্গ'-এর দামিনী সমাজের চাপিয়ে দেওয়া বৈধব্যযন্ত্রণা মেনে নেয়নি। এমনকি তারা নতুন করে পুরুষের ভালোবাসা পাবার স্বপ্ন দেখেছে।

'রাজসিংহ'র জেব-উন্নিসা ও চঞ্চলকুমারী প্রেমের স্পর্ধায় ঔরঙ্গজেবকে পর্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও হৈমন্তী, নিরুপমার পাশাপাশি অংকন করেছেন মৃণালিনী-চারুলতাকে। কবি 'মহুয়া' কাব্যের 'সবলা' কবিতায় নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি তুলেছেন। 'বিদায় অভিশাপ' এর দেবযানী উপযাচিকা হয়ে কচের কাছে নিজের প্রণয়ের কথা ব্যক্ত করেছে। 'চন্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের চন্ডালকন্যা চন্ডালিকার কাছেও প্রেমের প্রশ্নে সমাজের চোখরাঙানি তৃণবৎ হয়ে গেছে। এই সময়পর্বেই রচিত বেগম রোকেয়ার 'সুলতানা'স ড্রিম' ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম ফেমিনিস্ট ইউটোপিয়ান গ্রন্থ।

মধ্যযুগের সাহিত্যে নারীর প্রতিবাদের তেমন কোনো সুযোগ ছিল না, তবু তারা প্রতিবাদের ভাষা হারায়নি। এইসময়পর্বে চন্দ্রাবতী ছাড়া আর কোনো মহিলা সাহিত্যিকের নাম পাওয়া যায়নি। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের ধারায় বিশ শতকের শেষ পর্যায়ে থেকে মহিলা সাহিত্যিকরাই মহিলাদের কথা শুনিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে জ্যোতির্ময়ী দেবী, কামিনী দেবী, সরলা দেবী চৌধুরানী, নিরুপমা দেবী আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, বাণী বসু, সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মতো একাধিক লেখিকার নাম করা যায়। শুধু নারী নয়, নারী-পুরুষ উভয়েরই লেখনীতে সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলি প্রেমে-প্রতিবাদে-প্রতিরোধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্রৌপদী (মহাশ্বেতা দেবী); সত্যবতী, সুবর্ণলতা (আশাপূর্ণা দেবী); সুজাতা, মাধবীলতা (সমরেশ মজুমদার); রূপমঞ্জরী (নারায়ণ সান্যাল); মিতিন মাসি (সুচিত্রা ভট্টাচার্য); ময়নার মা (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)-এর মত মহিলারা সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে প্রতিবাদ -প্রতিরোধের প্রসঙ্গে পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। কপিলা (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) বা দয়িতারা (সুচিত্রা ভট্টাচার্য) প্রেমের টানে সামাজিক বাধা নিষেধকে পদদলিত করেছে। আবার প্রিয়তমের আঘাত নারীকে যে কতটা ভয়ানক করে তুলতে পারে তার প্রমাণ রয়েছে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'কাচের দেওয়াল', 'নীলঘূর্ণি', 'সহেলি'র র মতো একাধিক উপন্যাসে। ঋগ্বেদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসা নারীলাঞ্ছনার বিরুদ্ধে নিজের কবিতায় প্রতিবাদী আওয়াজ তুলেছেন মল্লিকা সেনগুপ্ত। মন্দাক্রান্তা সেনের 'নারী', 'অফার'-এর মতো কবিতায় রয়েছে নারী জাগরণের বার্তা। কবিতা সিংহের 'স্মরণীয়াসু', 'না', 'পৃথিবী দেখে না', 'অপমানের জন্য ফিরে আসি'-র মতো একাধিক কবিতায় নারীজীবনের ব্যথাগুলি ভাষ্য পেয়েছে। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে মধুসূদন দত্ত শর্মিষ্ঠা চরিত্রের মাধ্যমে নারীর স্বাধীনচিন্তার যে পরিসর তৈরি করে গিয়েছিলেন পরবর্তীকালে বাংলা নাটকের ধারায় জনা (গিরিশচন্দ্র ঘোষ), অহল্যা (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়), অপরাজিতা (নীতিশ সেন), অলকানন্দা (মনোজ মিত্র), দ্রৌপদী (শাঁওলি মিত্র)-র মতো চরিত্রগুলি সেই পরিসরকে আরো বিস্তৃত করেছে। বাংলা কথাসাহিত্যের প্রসঙ্গে বাংলাদেশের লেখিকা সেলিনা হোসেনের রচনাতেও নারীমুক্তির কথা বারেবারে চলে এসেছে। তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল উত্তর-ঔপনিবেশিক কালে নারী-পুরুষের সম্পর্কের চরিত্র প্রসঙ্গে। তাঁর রচনায় রয়েছে নারী জীবনের বহুমাত্রিক পাঠ। একটি সাক্ষাৎকারে নারীমুক্তির প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "সামাজিক মূল্যবোধের প্রেক্ষাপটে নারীর মর্যাদার আসন দৃঢ় করার জন্য আমি হাজার হাজার রোকেয়ার কথা বলেছিলাম।"[৫] তাঁর 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসের মূল উপজীব্য নিম্নবর্গের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই। কিন্তু এই উপন্যাসে তিনি চর্যাপদের যুগের বিচিত্রধর্মী নারী চরিত্রের সাথে পাঠকের পরিচয় করিয়েছেন। সেই চরিত্রের ভিড়ে ডোম্বি চরিত্রটি প্রেমে-প্রতিরোধে- প্রতিবাদে পৃথকভাবে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসে কাহ্নর স্ত্রী হল শবরী। শবরী কাহ্নর ঘরের মানুষ হলেও মনের মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি। শবরী কাহ্নর গৃহিণী।কিন্তু ডোম্বি তার বিপদে পরামর্শদাত্রী ও প্রিয় সখী। শবরী কাহ্নের উদ্দেশ্যে নিজেকে যত্ন করে সাজায়-

> "...পছন্দ মতো সাজতে পারলেই শবরী নিজেকে সবচেয়ে সুখী মনে করে। পুবদিকের বেড়া থেকে গুঞ্জার মালা নিয়ে গলায় ঝুলিয়ে দেয়। হাতে কেয়ূর। কটিদেশে মেখলা, পায়ে মল

শবরীর বিশেষ সখ। ঘুরেফিরে নিজেকে দেখে। সারাদিন চন্দন লেপে রাখার দরুন মুখটা এখন আশ্চর্য পেলব, গালে হাত ঘষে নিজেই অবাক হয় ও।"[৬]

কাহ্নপাদ রাজদরবারে কাজ করতে গেলে সে কাহ্নর জন্য বিরহ অনুভব করে, কিন্তু কাহ্ন কেন 'অনেক সম্মানের' এই কাজ ছেড়ে দিতে চায় তার মানে সে খুঁজে পায় না। শবরী কাহ্নকে কেবল তার গৃহস্থালির প্রেমময়,রোজগেরে কর্তারূপেই ভাবতে চায়। কাহ্নর মনকে যখন 'সবাই রাজা' হওয়ার চিন্তা বিহ্বল করে, তখন শবরী হাঁড়িয়ার নেশায় কাহ্নকে শান্ত করতে চায়। কিন্তু কাহ্নর সাম্যবাদী চিন্তাধারার নাগাল সে ধরতে পারে না। শবরীর কাছে ভালোবাসা মানে সুন্দর করে সেজেগুজে কাহ্নর চোখে রমণীয় হয়ে ওঠা, আর সুন্দর করে রান্না করে স্বামীর রসনা পরিতৃপ্ত করা। শুধু স্বামীকে খাইয়েই সে তৃপ্ত নয়,কাহ্নর এঁটো পাতে খেয়ে পতিসেবার পুণ্য ষোলোআনাই লাভ করতে চায় সে। কাহ্নের পল্লীতে শবরীর মতই আর এক পতিপ্রাণা নারী হলো ধনশ্রীর স্ত্রী ভৈরবী। সচ্ছল গৃহস্থ কামোদ তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলেও ভৈরবীর বাবা তা চাননি। ভৈরবীর নিজের কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছা ছিল না। ভৈরবীর স্বামী ভৈরবীকে যথেষ্ট ভালবাসলেও তার দায়দায়িত্ব জ্ঞান বড্ড কম। অভাবের সংসারে অর্থোপার্জনের কথা না ভেবে সে দাবার নেশাতে মশগুল থাকে। বাড়ির অভুক্ত শিশু বা আগত অতিথির কথা তার মনেই থাকে না। কিন্তু ভৈরবী এ বিষয়ে অভিযোগহীন,

"একদিকে অভাব আর অন্যদিকে স্বামীর খামখেয়ালি, এ দুইয়ের মধ্যে অনবরত যুদ্ধ করতে হয় ওকে। ও একেই ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছে, আক্ষেপ নেই, প্রতিবাদ নেই। ভীষণ মনখারাপ হলে নিজের মধ্যে গুমরে মরে। নিজেকে পীড়ন করেই ও আনন্দ নিংড়ায়।"[৭]

নিজের মানসম্মান খুইয়ে কামোদের থেকে চালডাল এনে সংসারের চাহিদাকে ঠেকা দেয় সে। কিন্তু কামোদের বউ তপতী সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের মানুষ। সংসারের অভাব তার বরদাস্ত হয় না। তার দাবিদাওয়া পূরণে সামান্যতম ত্রুটি হলে সে স্বামীকে গালাগাল পর্যন্ত দেয়।

দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর 'চর্যাপদ'-এর প্রেক্ষিতে রচিত এই উপন্যাসে দেখা গেছে যে, তথাকথিত নিম্নবর্ণের সমাজে বাইরের জগতের সাথে মেয়েদের মেলামেশায় কোনো বাধা ছিল না। পুরুষের সাথে তারা সমানতালে আর্থিক উপার্জনে অংশগ্রহণ করত। এই উপন্যাসের দেবকী তেমনই একজন নারী। সে মদ চোলাই করে, খদ্দেরদের আপ্যায়ন করে এবং কড়িরও হিসাব রাখে। লোকী-গুণী, সুলেখা বা ভৈরবীর মত মেয়েরা দেবকীর মত অর্থোপার্জন না করলেও তাদের ছাড়া সংসার অচল। শাকপাতা-গুগলি-শামুক কুড়িয়ে, চাঙারি বুনে তারা সংসারকে ঠেলে নিয়ে চলে। নদীর ঘাটে খেয়া পারাবার করে ডোম্বি। আপাদমস্তক প্রাণশক্তিতে ভরপুর সে। ডোম্বি স্বামী পরিত্যক্তা। তার স্বামী তার চোখের সামনে অন্য মেয়ে নিয়ে সংসার করে। কিন্তু 'চরৈবেতি'-র ধারণায় বিশ্বাসী ডোম্বিকে এই বিচ্ছেদ ভাঙতে পারেনি, বরঞ্চ তাকে সামনে এগিয়ে চলার জেদ যুগিয়েছে। সে সুপটু ব্যবসায়ী। পারের কড়ির ব্যাপারে সে অত্যন্ত কড়া। কিন্তু কাহ্ন তার বিনা কড়ির খদ্দের।তাকে পার না করালে নাকি ডোম্বির 'খ্যাপ সাঁইত' হয় না। 'ডোম্বি' নামটি তার সামাজিক পরিচয়বাহী। কিন্তু কাহ্নর কাছে সে 'ডোম্বি' নয়, সে রাগিণীর মতোই প্রিয় এক নারী -'মল্লারী'। কাহ্নও তার কাছে বড় সাধের 'কানাই'। ব্যাৎসায়ন তাঁর 'কামসূত্র'-এ নরনারীর জীবনকে সুখময় করা নির্দেশ রূপে যে চৌষট্টিটি কলার কথা বলেছিলেন , কাহ্নর স্ত্রী সেই চৌষট্টি কলার মধ্যে সৌন্দর্যকলা ও রন্ধনকলায় বিশারদ। কবি কাহ্নর চোখে এই সৌন্দর্য সাধনা যেন প্রার্থনার মত। কাহ্নর সেই প্রার্থনায় শবরী এক মন্দির। কিন্তু ডোম্বি যেন চৌষট্টিকলার অধিকারিণী,-

"'তোমাকে ভালো লাগার অনেক গুণ আছে।'
'সত্যি?'
'হ্যাঁ গো,সত্যি।'

'কী গুণ বলো দেখি?'

'সে মেলা, কয়টা বলব?'

'যে কয়টা মনে আসে তাই বলো?'

'যেমন গাইতে পারো,নাচতে পারো, নৌকা বাইতে পারো, ভালোবাসতে পারো এবং কবির মনে শক্তি যোগাতে পারো।' "[৮]

–'কবির মনে শক্তি যোগাতে' পারার প্রসঙ্গেই শবরীর থেকে ডোম্বি আলাদা হয়ে গেছে কবি কাহ্নর চোখে।

কাহ্ন রাজবাড়িতে পাখা টানে। সেখানে তার জাতের অন্য মানুষের প্রবেশাধিকার পর্যন্ত নেই।রাজার গাড়িকে কাদা থেকে তুলে দিয়ে রাজাকে বিপদ থেকে রক্ষা করার বিনিময়ে সে এ কাজ পেয়েছে। সেখানে 'ব্রাহ্মণদের নাক সিঁটকানো ভাব' তাকে প্রতিমুহূর্তে চাবুকের মতো আঘাত করে। নীলরক্তের কাঁটাকুটো চেটে আত্মগ্লানিতে ডুবে যেতে থাকে সে। কিন্তু তার এই যন্ত্রণা শবরী উপলব্ধি করতে পারে না। অন্যদিকে কাহ্নর মনের এতোটুকু আঁধারও মল্লারীর চোখ এড়ায় না,-

"'মাঝে মাঝে তুমি কি যেন ভাবো।'

'কই না তো? তুমি বেশি দেখতে পাও।'

'আমাকে ফাঁকি দিও না। তোমার মুখ দেখলে আমি সব টের পাই।'"[৯]

৪

যে অসম্মান অপমানের কালি কাহ্নর মনে আঁধার জমিয়ে তুলেছে তা মুছে দেবার প্রয়াসে সে নিজের প্রাণকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে। দেশাখ এই পল্লীর নেতা। নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে সে রাজার সাথে লড়াইয়ে প্রস্তুত। কিন্তু ডোম্বিকে সেও ভয় পায়। ডোম্বির ব্যক্তিত্বই এই ভয়ের উৎস। তার কথা বলার সাবলীলতা, আত্মবিশ্বাসী মূর্তি কাহ্নর মনেও সম্ভ্রম জাগায়। শিকারে যাওয়ার সময় দেশাখ ও তার দলবল ডোম্বিকে পারের কড়ি দিতে চায়নি। কিন্তু ডোম্বি তার ন্যায্য দাবিতে অটল। তখন নিরুপায় আক্রোশে কামোদ ও দেশাখের মতন বীরপুরুষেরা নিচুস্বরে ডোম্বিকে গালাগাল দেয়। কারণ,তাদের কথা ডোম্বির কানে গেলে বইঠার ঘায়ে মাথা দু -ফাঁক হয়ে যাবে। নদীতে বড় মাছ দেখে পুরুষদের জিভ দিয়ে যখন লালা ঝরেছে তখন ডোম্বিই একমাত্র নিজেদের যন্ত্রণা ও বঞ্চনার কথা তুলে ধরেছে- "'কিন্তু ওই মাছ তো আমাদের কপালে জুটবে না। ও তো আগে রাজার হেঁসেলে যাবে।'"[১০] ডোম্বির এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি তার প্রতিবাদী মানসিকতারই পরিচয় দেয়।

ডোম্বির মনে সর্বদাই এক প্রতিশোধের আগুন জ্বলে। সে প্রতিশোধ উচ্চবর্ণের শোষণের বিরুদ্ধে নাকি তার জীবনের অসম্পূর্ণ বাসনাজাত- তা স্পষ্ট নয়। তবে ডোম্বি যেখানে অন্যায় দেখে সেখানেই গর্জন করে ওঠে। উৎসব প্রাঙ্গণে শবরীর সাথে কাহ্নকে দেখে ডোম্বির কাছে উৎসবের রং ফিকে হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে যে, কাহ্ন তাকে ভালবাসলেও শবরী তার স্ত্রী, সমাজের চোখে তার দাবি অনেক উপরে। সামাজিক এই সম্মান সে কোনোদিনই পাবে না।তখন তার মনে হয় যে,বহু গুণে গুণবতী হয়েও তার জীবনে লোকসানের পাল্লাই ভারী। আর বিপুল লোকসানের বোঝা তাকে বেপরোয়া, জীবনের প্রতি মমত্বহীন করে দিয়েছে। সে চায় জীবনের বিনিময়ে হলেও সব অসাম্য, সব অন্যায়ের বিনাশ ঘটাতে।

রাজা বুদ্ধমিত্রের কাছে রাজসভায় নিজেদের ভাষায় রচিত নিজের গান গাওয়ার অনুমতি আদায় করে কাহ্ন। এই অনুমতি পেয়ে কাহ্ন আনন্দে দিগবিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মল্লারীর মধ্যে প্রথম থেকেই এই বিষয়ে একটা সন্দেহ জাগে। সে জানে উচ্চসমাজের কাছে তাদের ছোট জাতের যেমন কোন অধিকার নেই, তেমনি তাদের ভাষা ও কৃষ্টিরও কোনো সম্মান নেই। কিন্তু এই ঘটনায় শবরী পতিনিষ্ঠ পত্নীর মতোই

স্বামীর সুখে সুখী হয়েছে। স্বামী সারারাত জেগে গীত রচনা করলে সেও সারারাত কাহ্নর পাশে জেগে বসে থেকেছে। কিন্তু নিজের ভাষাকে যোগ্য সম্মান দিতে পারবে কিনা- এই আশাআশঙ্কায় দোদুল্যমান কাহ্নর দুশ্চিন্তার যথার্থ কারণ সে অনুধাবন করতে পারেনি। বরঞ্চ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কাহ্নর শবরীর প্রতি অমনোযোগ বা ভালোভাবে না খাওয়া-দাওয়া তাকে ব্যথিত করেছে। কিন্তু সেই ব্যথার উৎস নির্ণয়ের ক্ষমতা বা মানসিকতা কোনোটাই তার নেই। এইখানেই মল্লারী আর পাঁচটা নারীর থেকে স্বতন্ত্র। এরপর মল্লারীর আশঙ্কাই সত্যি হয়। কাহ্ন রাজবাড়িতে মাতৃভাষায় রচিত গীত পাঠ করতে ব্যর্থ হয়। অপমানিত কাহ্ন তার অপমানের জ্বালা জুড়াতে দেবকীর মদিরায় বেহুঁশ হতে চায়। কিন্তু তার অন্তরের জ্বালা জুড়াতে দেবকী বা তার বানানো মদ ব্যর্থ। কারণ, এই জ্বালার উৎস যেখানে সেখানে প্রলেপ দেবার ক্ষমতা কারোরই নেই-না শবরীর, না মদিরার। সেই ক্ষমতা আছে কেবল মল্লারীর। তাই কাহ্ন নিজের অজান্তেই পৌঁছে গেছে মল্লারীর দুয়ারে। কাহ্ন জানে দেবকীর মদ যে নেশা তৈরি করতে পারেনা,তা পারে মল্লারীর প্রতিবাদী মন। মল্লারীর প্রতিবাদী সত্তাই কাহ্নর আহত মনের একমাত্র মলম।

কাহ্ন রাজসভায় অপমানিত হয়ে বিনা প্রতিবাদেই ফিরে এসেছিল। নিজের এই অবস্থার জন্য তার মনে গ্লানি তৈরি হলেও তার এই অবস্থার জন্য দায়ী দেবলভদ্র ও তার অনুচরবৃন্দের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ সে করতে পারেনি। কিন্তু প্রতিবাদী মল্লারী তার মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিল। নিজের ভাগ্যকে ভবিতব্য বলে মেনে নেওয়া কাহ্নকে সে প্রতিবাদের পাঠ শিখিয়েছে-

"'মল্লারী দেবল ভদ্র আজ আমাকে ভীষণ অপমান করেছে।'

'কেন? গীত পড়োনি?' মল্লারীর দু- চোখের পাতায় ঝিলিক।

'আমি ছোটলোক, মুখের ভাষায় গীত লিখি, সব ছুঁচোর কেত্তন। দেবল ভদ্র আমাকে দরবার থেকে বের করে দিয়েছে।'

'তুমি কি করলে?' মল্লারীর এর কণ্ঠে চাপা ক্রোধ।

'কিছু করিনি।'

মল্লারী তেড়ে ওঠে, 'কিছু করলে না? মাথা ফাটিয়ে দিতে পারলে না?'

'তাহলে কি আমাকে কি আস্ত রাখত?'

৫

'না রাখলে মরতে, আমরা সবাই জানতাম তুমি মুখের ভাষার জন্য মরেছ। কুকুরের মত লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যদি আসবে তবে গেলে কেন ওখানে?'

'মল্লারী?'

মল্লারী সমান তোড়ে বলে, 'পারো কেবল অবাক হতে, আমি যা বলি মনের কথা বলি, একটুও ফাঁকি নেই। যাকে তুমি প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসো তার জন্য মরতে পারো না?' "[১১]

কাহ্নকে সে পরামর্শ দিয়েছে- "'মনকে পুড়িয়ে কষ্ট দিয়ে লাভ কী? পারলে দেবল ভদ্রের বাড়িটা পুড়িয়ে দাও।'"[১২] মল্লারীর এই কথাগুলি কাহ্নর সমস্ত সত্তায় প্রতিবাদের আগুন জ্বেলে দেয়। ডোম্বির এই উক্তি যেমন নিজের মাতৃস্বরূপা ভাষার জন্য কাহ্নকে আত্মোৎসর্গের প্রেরণা দেয়, তেমনি ডোম্বিও যে তার প্রিয় মানুষ কাহ্নর অপমানের জবাব দিতে নিজের জীবন বাজি রাখতে পারে, তারও ইঙ্গিত দিয়ে যায়। সে কাহ্নর মাথায় হাত রেখে কাহ্নর অপমানের প্রতিশোধ নেবার শপথ নেয়।

ডোম্বি আজন্ম প্রতিবাদিনী। তার পরিহাসেও মিশে রয়েছে প্রতিবাদ । ঘাটের শুল্ক আদায়কারীকে সে মজা করে 'তরপতি' বলে ডাকে। উচ্চবর্ণের মানুষদের গায়ে কোনো নীচজাতির লোকের ছায়া পড়লে বিষম পাপ হয় এবং সেই নীচবর্ণের মানুষটিকে শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণরা কোন নিম্নবর্ণের নারীর সাথে ব্যভিচার করলে তার বেলা কোন দোষ হয় না। তরপতি ডোম্বিকে কর চাইলে তরপতিকে ব্যঙ্গ করে ডোম্বি তাই বলে,- "'আপনার কড়ি আমার কাছে এলেই এ কর শোধ হবে.....'"[১৩] কিন্তু রাজপুরুষদের সাথে ডোম্বির দৈহিক সম্পর্ক কেবল কড়ির গন্ডিতেই আবদ্ধ। কানু আছে তার সমগ্র সত্তা জুড়ে। উচ্চবর্ণের এঁটো ডোম্বিকে শুদ্ধ স্নান করায় যে নদীর স্রোত,ডোম্বির কাছে কানু সেই নদীর থেকেও আপন, "'নদী তুই আমার সব- মা, বাবা, বন্ধু, কেবল তুই আমার কানু হতে পারিস না।'"[১৪] সরকার যখন ঘোষণা করেছে, উচ্চবর্গের পুরুষের নিম্নবর্গের নারীগমন আইনসিদ্ধ,তখন সকলে অসন্তুষ্ট হয়েছে। ডোম্বির গায়েও তখন বিছুটির জ্বালা ধরেছে। উচ্চবর্ণের লোকেদের উদ্দেশ্যে সে চিৎকার করে বলেছে, "'বেশ হল,খদ্দের বাড়ল আমার, রোজগারও বাড়বে। দেশের রাজা আমাদের ভারি দয়ালু। গরিবের দিকে দৃষ্টি আছে।'"[১৫] বেড়াল তপস্বীদের এই ছুঁৎমার্গকে সে ঘৃণার চোখে দেখে। অরণীবাবুকে পার করতে গিয়ে অরণীবাবুর গায়ে ইচ্ছা করে জল ছিটিয়ে দেয় সে। দেশাখদের মতো সংগঠকের প্রতিবাদের পাশাপাশি ডোম্বির এই ধরনের মজার মধ্যেও কম প্রতিশোধস্পৃহা লুকিয়ে নেই।

ডোম্বির 'বামুন' সঙ্গ নিয়ে কাহ্ন কোনো প্রশ্ন না করে না। কিন্তু এ বিষয়ে ডোম্বি যেন কাহ্নর প্রতি এক অদৃশ্য দায়বদ্ধতা অনুভব করে। সে কাহ্নকে বলে- "'তুমি রাগ কোরো না কানু। বামুনগুলোকে সবদিন ঢুকতে দেই না। যেদিন কড়ি থাকে না, উপোস করতে হয় সেদিনই কেবল দেই।তুমি রাগ করেছ কানু?'"[১৬] কাহ্ন এই সমস্যার সমাধান খোঁজে ভালোবাসার পন্থায়-

> "'আমার যদি অনেক কড়ি থাকতো মল্লারী!'
> 'তাহলে বুঝি পথে পথে ছিটিয়ে বেড়াতে?'
> 'না পথে নয়। ভালোবাসা বাঁচাতাম।'"[১৭]

এই ছোট্ট কথোপকথনেই তাদের আত্মিক ভালোবাসা ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কাছে তাদের নিরুপায়তার প্রসঙ্গ স্পষ্ট হয়ে যায়।

সমস্ত পল্লীই রাজা ও তার অনুচরবর্গের হাতে অত্যাচারিত। কিন্তু রাজবাড়ির সুখরাত্রিব্রতের দই ও সরষে দিয়ে রাঁধা মাংসের প্রতি তাদের বড় আকর্ষণ। তবে কাহ্নর কাছে ওইদিনের আকর্ষণ ডোম্বির নাচ। ডোম্বির নাচ তার মনে এতটাই আনন্দ দেয় যে, সে বেড়া থেকে পাখির পালকের কলমটা নামিয়ে নিয়ে লিখে ফেলে,-

> "ভব নির্বাণে পড়হ-মাদলা
> মন বপন বেণি করণ্ডকশালা।।
> জঅ জঅ দুন্দুহি-সাদ উছলিআঁ
> কাহ্ন ডোম্বি-বিবাহে চলিআ।।"[১৮]

কাহ্নর এই পদরচনা ডোম্বিকে কেন্দ্র করে কাহ্নর মনের সুপ্ত বাসনারই কাব্যিক রূপ। জবার দেশে বিরল গোলাপ মল্লারী যেমন জোগাড় করেছে কানুর জন্য,তেমনই কানুও তার জন্য তৈরি করেছে শিল্পীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার-গান। কাহ্ন তার গানের যথার্থ সুর খুঁজে পায় ডোম্বির কণ্ঠে। শবরীর প্রতি স্বামী হিসেবে সে যথেষ্ট দায়িত্বশীল ও প্রেমময় হলেও সেই প্রেম কেবল সংসারেই আবদ্ধ।

৬

আর ভাবের জগতে কাহ্নর রাণী কেবল মল্লারী। রাজার ভোজে কাহ্ন যায়নি দেখে ডোম্বি আনন্দিত হয়েছে এবং সে নিজেও যায়নি। যে রাজদরবার তার কানুকে অপমান করেছে, সেখানে খাবার কথা ভেবে তার বমন

উদ্রেক হয়। ডোম্বি কোনো পুঁথি পড়েনি বা কাহ্নর মত সে কবিও নয় -দেশাখের মত সে যুদ্ধবিদ্যায় পারঙ্গমও নয়। তবু এ কথা ঠিক যে, স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান কেবল যুদ্ধে হয় না। তার জন্য দরকার গণচেতনা। সেই গণচেতনার আলোকে ডোম্বি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আলোকিত। ধর্মতঃ শবরী কাহ্নর অর্ধাঙ্গিনী। কিন্তু কাহ্নর শরীরে যে অপমানের শলাকা বিদ্ধ হয়ে রয়েছে তা শবরীর চেতনায় ধরা পড়ে না। তাই কাহ্নর চাকরি ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত সে সহজে মেনে নিতে পারেনি। নিশ্চিত ভাতের আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হতে আর পাঁচটা নারীর মতোই সে ভয় পায়। যে ভাতের ও পুরুষের আশ্রয়ের খোঁজে সুলেখা ভুসুকুর স্মৃতি ভুলে সুদামের ঘরে গিয়ে উঠেছিল সেই ভাতের ভয় ছিল ডোম্বিরও। পরে ধনশ্রী ও ভৈরবীর প্রতি অবিচারের কথা ভেবে শবরী মনে করে যে, অত্যাচারী রাজার চাকরি ছেড়ে কাহ্ন ঠিকই করেছে। কিন্তু ততক্ষণে ডোম্বি কাহ্নর মনে যে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল সেখানে শবরীর এই মানসিকতার পরিবর্তনের আর কোনো প্রয়োজন কাহ্নর কাছে ছিল না।

কাহ্ন ছোটজাতের মানুষ। রাজদরবারে প্রবেশ করা তার পক্ষে যেমন কঠিন,বের হওয়াও তেমনি প্রভুর অনুমতিসাপেক্ষ। তার ওপর আবার কাহ্ন ব্রাহ্মণ প্রভুদের বিদ্ধ করে গীত রচনা শুরু করেছিল-

"নগর বাহিরেরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুঁড়িআ।
ছোই ছোই যাইসি ব্রাহ্ম নাড়িআঃ"[১৯]

তার এই গানে নিম্নবর্গের মানুষ উচ্চবর্গের প্রতি প্রতিবাদ জানানোর ভাষা খুঁজে পায়। জোয়ান ছেলেরা পথে-ঘাটে হাততালি দিয়ে এই গীত গাইতে থাকে। শবরীও এই গানে নিজের জাতির প্রতি হওয়া লাঞ্ছনার যোগ্য প্রত্যুত্তর শুনতে পায়। রাজার লোক এই গীত রচনার অপরাধে কাহ্নকে আটক করে। এমন পরিস্থিতিতেও কাহ্ন ভয় পায় না। বরঞ্চ কাহ্ন গণঅভ্যুত্থানের ডাক দিয়ে বলে- "ভয় পাই না দেশাখ। এক কানু গেলে কী হবে, তোরা তো আছিস।"[২০] এই ঘটনার অভিঘাতে শবরী আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লেও ডোম্বির চোখের জল প্রতিশোধের আগুনে শুকিয়ে গিয়েছিল। এই প্রতিবাদী মনোভাব থেকেই কাহ্ন নিজের জীবন রক্ষার সুযোগের বিনিময়েও রাজার প্রশস্তি লিখতে অস্বীকার করে। যে কাহ্ন রাজসভায় গীত পরিবেশন করতে না পেরে মাথা নিচু করে বেরিয়ে এসেছিল এই কাহ্ন সেই কাহ্নর থেকে অনেক আলাদা। এই কাহ্নর কারিগর হলো ডোম্বি। অন্যদিকে কাহ্নর এই পরিণতি ডোম্বিকেও বেপরোয়া করে তোলে। ব্রাহ্মণ মন্ত্রী দেবলভদ্রের ভাগ্না দেহের লোভে শবরীর কাছে এলে শবরী তার বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়। অসমসাহসী এই কাজের মাধ্যমে মাধ্যমে সে যেমন নিজের প্রেমাস্পদের প্রতি হওয়া অন্যায়ের প্রতিশোধ নেয়,তেমনি নিম্নবর্ণের প্রতিটি মানুষ তথা নারীর হয়েও প্রতিশোধ নেয়। সে জানে এই কাজের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু সমাজের জন্য, প্রেমের জন্য মরতে তার ভয় নেই। কেবল আক্ষেপ- শেষবারের মতো কানুর সাথে দেখা হলো না। তার মৃত্যুর সাথে সাথে তার প্রতিবাদের বাণীও যাতে মরে না যায় সেইজন্য আকুলস্বরে সে দেশাখকে বলেছে- "দেশাখ আমার কথা তোর মনে থাকবে ?"[২১]

'নীল ময়ূরের যৌবন' -উপন্যাসে যৌবনে দশম-একাদশ শতাব্দীর সময়কার এক নিম্নবর্গের পল্লীর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তাদের জীবনচর্যা, বঞ্চনা, তাদের রাজা তথা উচ্চবর্গের মানসিকতা ও তাদের প্রতিবাদই এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। তবে এই উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি আদি ও মধ্যযুগের মধ্যযুগের অন্যান্য কাব্যের নারী চরিত্রের তুলনায় কিছুটা স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। মূল 'চর্যাপদ' পাঠ করলেও দেখা যাবে, সেই সমাজের মেয়েরা অবরোধবাসিনী ছিল না। এই উপন্যাসের নারীরাও অবরোধবাসিনী নয়, বরঞ্চ তারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী। বিবাহিত বা অবিবাহিত- উভয় প্রকার নারীই জীবনসঙ্গী নির্বাচনে যথেষ্ট স্বাধীন ছিল। সুলেখা যখন সুদামের সাথে নতুন সংসার পেতেছে তখন তেমন কোন প্রশ্ন ওঠেনি। উৎসবের রাত্রিতে নারী-পুরুষের

নিজেদের ইচ্ছামত জুড়ি নির্বাচন এই স্বাধীনতারই পরিচয়বাহী। তবে এখানে একটি প্রশ্ন চিহ্ন রয়ে যায় । প্রবন্ধের শুরুতেও দেখানো হয়েছে যে, নারী দিবস পালন বা নারীর ভোটাধিকার অর্জনই নারীর সামাজিক সম্মানের প্রসঙ্গে শেষ কথা নয়। তাহলে বিংশ শতাব্দীতেও নারীকে 'second sex' বলা হত না বা একবিংশ শতাব্দীতে ধর্ষণ, বধূহত্যা, marital rape-র ঘটনা ঘটত না। 'নীল ময়ূরের যৌবন' উপন্যাসের মেয়েদের সম্পর্কেও ঠিক একই কথা বলা যায় । সমাজে ডোম্বি যতই স্বাধীনচেতা হোক না কেন উচ্চবর্ণের দ্বারা নিগৃহীত হতে সে বাধ্য ছিল। একটি সুখী সংসারের আশায় ভৈরবী যতই মুখ মুখ বুঝে ধনশ্রীর সব দায়িত্বজ্ঞানহীনতা মেনে নিক না কেন, যমজ সন্তান জন্ম দেওয়ার কারণে অযৌক্তিকভাবে ব্যভিচারিতার হাস্যকর অভিযোগ এনে তাদের সংসার ভেঙে দেওয়া হয়। বিশাখের বোন

৭

লোকী ও গুণী ধান জমি থেকে সামান্য শাক-গুগলি তুলতে গিয়ে রাজার পেয়াদা নিখিলের লালসার শিকার হয়। উচ্চবর্ণের নারীরাও এর ব্যতিক্রম নন। রাণী রাজসভার সকলের কাছে সম্মান পান। বহুমূল্য বস্ত্র-অলংকারে তিনি সজ্জিত। কিন্তু নারী হিসেবে তিনি চরম অপমানিত-

> "উৎসবের শুধু প্রথম পর্বের জন্য চন্দ্রলেখা, দ্বিতীয় পর্বে তার কোন অধিকার নেই। যখন নর্তকীর নূপুরনিকবণে চঞ্চল হয়ে উঠবে বুদ্ধমিত্রের সমস্ত শরীর তখন চন্দ্রলেখার জন্য দরবারের দরজা বন্ধ, তার স্থান অন্দরমহলে। সে অবস্থান প্রতিবাদহীন, চন্দ্রলেখা নিজেও তা জানে এবং জেনেও তা সহ্য করে।"[২২]

দরিদ্র ধনশ্রীর মতো সরকারের কর আদায়কারী কর্মচারী অরণীকেও শালার ভাস্তের কন্যার নামে মিথ্যা কলঙ্কের কারণে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করতে হয়েছে।

এই উপন্যাসে নিম্নবর্ণ ও উচ্চবর্ণের একাধিক নারীর প্রসঙ্গ এসেছে। নিম্নবর্ণের ভৈরবী, লোকী-গুণীরা জাতির বা নিজেদের অবস্থার প্রতিবাদ করেনি। এমনকি দেশের রাণীও নারীত্বের অপমান সহ্য করে নিয়েছেন নীরবে। তাই বলা যেতে পারে, নারীর এই বঞ্চনার জন্য নারীদের সর্বংসহা মনোভাবই অনেকাংশে দায়ী। কিন্তু ডোম্বি একজন সহায়সম্বলহীনা, আত্মীয়পরিজনহীনা মেয়ে হয়েও সমস্ত জাতির হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। সুলেখার দাম্পত্যে সাময়িক ছেদ পড়লে সুলেখা নতুন ঘর খুঁজে নিয়েছে। কিন্তু বিবাহবিচ্ছিন্না ডোম্বি আর বিবাহ করতে চায় না। সে নিজের মতো করে সে বাঁচতে চায়। সে প্রাণপণে করে বিশ্বাস করতে চায় যে, বিচ্ছেদ তার জীবনের কণামাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। প্রাণশক্তিতে ভরপুর ডোম্বি আবার নতুন করে বাঁচতে চায়। বাড়ির পাশে চাঁচর বেড়া তোলে, কার্পাস লাগায়, হরিণের মাংস খায়, মাছ ধরে- সর্বোপরি যে কাহ্নকে সে কোনদিনই সামাজিকভাবে পাবে না, সেই কাহ্নকে সে প্রত্যাশাহীনভাবে ভালোবাসে।

কাহ্নর সমাজের প্রতিটি মানুষই ছিল উচ্চবর্ণের হাতে নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, অপমানিত। তারা সেই অপমানকে ভবিতব্য বলেই মেনে নিয়েছিল। তবে নিমাইয়ের মত সকলেই যে শাসকের ভয়ে স্বজাতিকে চুপচাপ শাসকের পদলেহন করতে পরামর্শ দিত, এমন নয়। প্রত্যেকেরই বুকের মধ্যে চাপা অসন্তোষ ছিল। কিন্তু উপন্যাসের প্রথম থেকেই ডোম্বি ও দেশাখ চরিত্রদুটি প্রতিবাদে মুখর। দেশাখ রাজদ্রোহের মাধ্যমে এক সাম্যবাদী রাজ্যের জন্ম দেওয়ার স্বপ্ন দেখতো। তার সেই মানসিকতা সে তার প্রেমিকা বিশাখার মধ্যেও সঞ্চালিত করতে পেরেছিল। দেশাখের মতো ডোম্বিও ছিল আজন্ম প্রতিবাদিনী। আর্থিক স্বাবলম্বী, স্বাধীনচেতা, স্বয়ংসম্পূর্ণা এই নারী ছিল নির্ভীক। স্বজাতি বা উচ্চবর্গ- কারোরই অন্যায় সে সহ্য করেনি। যখন তার প্রাণের কানুকে সে অত্যাচারিত হতে দেখেছে, তখনই তার প্রতিবাদ প্রতিশোধে পরিণত হয়েছে। প্রতিশোধস্পৃহায় মৃত্যু পর্যন্ত তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে। আর তখনই পাটনী, নৃত্যগীত পটীয়সী,প্রেমিকা ডোম্বি প্রতিবাদে, প্রতিরোধে হয়ে

উঠেছে এক জলন্ত অগ্নিশিখা। যে অগ্নিশিখা নিজে ছাই হয়ে গিয়েও প্রতিবাদের ভাষা যুগিয়ে দিয়েছে প্রতিটি ভীত,সন্ত্রস্ত জনতার মুখে।

তথ্যসূত্র:

১) ইসলাম, নজরুল। নজরুল রচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড)। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭, পৃ. ৮৯।
২) দাশ, নির্মল। চর্যাগীতি পরিক্রমা। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ১৯৯৭, পৃ. ১৬২।
৩) মুখোপাধ্যায়, সুতপা। বৈষ্ণব জীবনী সাহিত্যে নারীসমাজ। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,১৪০৩। পৃ. ২৬।
৪) বন্দোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা)। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী (দ্বিতীয়ভাগ)। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ। পৃ. ১২২।
৫) সাক্ষাৎকার, বইয়ের দেশ। কলকাতা: এবিপি প্রাইভেট লিমিটেড, এপ্রিল-জুন ২০২২। পৃ. ৯৭।
৬) হোসেন, সেলিনা। নীল ময়ূরের যৌবন। কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ২০০৯। পৃ. ১।
৭) তদেব, পৃ. ২০।
৮) তদেব, পৃ. ১৩।
৯) তদেব, পৃ. ১৪।
১০) তদেব, পৃ. ২৬।
১১) তদেব, পৃ. ৫১-৫২।
১২) তদেব, পৃ. ১০৫।
১৩) তদেব, পৃ. ৫৬।
১৪) তদেব, পৃ. ৬০।
১৫) তদেব, পৃ. ৬০।
১৬) তদেব, পৃ. ৮৫।
১৭) তদেব, পৃ. ৮৬।
১৮) তদেব, পৃ. ৯৫-৯৬।
১৯) তদেব, পৃ. ১৩১।
২০) তদেব, পৃ. ১৩১।
২১) তদেব, পৃ. ১৩৭।
২২) তদেব, পৃ. ৪২।

গ্রন্থপঞ্জি:

আকর গ্রন্থ:

১) হোসেন, সেলিনা। নীল ময়ূরের যৌবন। কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ২০০৯।

সহায়ক গ্রন্থ:

১) Beauviour, Simon de. The Second Sex. Vintage Classic, 1949
২) ইসলাম, নজরুল। নজরুল রচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড)। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭।
৩) দাশ, নির্মল। চর্যাগীতি পরিক্রমা। কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ১৯৯৭।

৪) বন্দোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত দাস (সম্পা)। ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী (দ্বিতীয়ভাগ)। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।

৫) বসু, বাণী। মৈত্রেয় জাতক। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৪।

৬) বসু, রাজশ্রী ও বাসবী চক্রবর্তী। প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা। কলকাতা: উর্বী প্রকাশন, ২০১৪।

৭) ভট্টাচার্য, আশুতোষ।বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস। কলকাতা: এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২।

৮) ভট্টাচার্য, তপোধীর। নারী চেতনাবাদ মননে ও সাহিত্যে। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৭।

৯) ভট্টাচার্য, সুকুমারী। প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০০৬।

১০) মুখোপাধ্যায়, সুতপা। বৈষ্ণব জীবনী সাহিত্যে নারীসমাজ।কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৪০৩।

১১) সেন, সুকুমার।প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৩।

১২) সেনগুপ্ত, মল্লিকা। স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৪।

সহায়ক পাত্রিকা:

১) সাক্ষাৎকার, বইয়ের দেশ। কলকাতা: এবিপি প্রাইভেট লিমিটেড, এপ্রিল-জুন ২০২২।